বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসার, জনপ্রিয়করণ ও প্রচার: ভবিষ্যতের পথ

শান্তনু ঘোষ

শান্তনু ঘোষের লেখাপড়া কলকাতা ও দিল্লিতে।পেশায় প্রাণীবিজ্ঞানী, নেশা বন-জঙ্গল।বিশেষ ভালোবাসার প্রাণী হাতি।গবেষণার কাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের নানান দুর্গম জঙ্গলে।ড: সালিম আলির স্নেহধন্য, ইয়ান, ডগলাস হ্যামিলটন ও লালাজী বরুয়ার প্রিয় এই ছাত্র প্রাণীবিজ্ঞানের অসংখ্য মৌলিক গবেষণাপত্রের রচয়িতা।জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী।বাংলায় বিজ্ঞান লেখেন নিয়ম করে, বাংলায় বিজ্ঞানের একাধিক বই।কলকাতা দূরদর্শন ও আকাশবাণীর প্রাক্তন উপদেষ্টা ও নিয়মিত প্রোগ্রামার।

সংক্ষিপ্তসার

ছিল।প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার একটা ক্ষীণ ধারা অবশ্যই ছিল।সেই ধারাটিও অবলুপ্ত হয়ে যায় দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্যের মৃত্যুর পরে। মুসলমান শাসনে।তারপর ৮০০ বছরের এক অন্ধকার সময়।ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অশিক্ষা থেকে বাঙ্গালীকে উদ্ধার করতে দরকার ছিল এক বৃষস্কন্ধ।এগিয়ে আসেন মহাত্মা রামমোহন।সেটা ইংরেজ শাসনের সময়।গোরাদের ভাবখানা ছিল - 'বিজ্ঞান' বড় কঠিন ব্যাপার, ওটা ভারতীয়দের জন্য নয়।রামমোহনের উৎসাহ ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'হিন্দু কলেজ'। এমনকি উনিশ শতকের গোড়াতেও বাংলায় অমিল ছিল বিজ্ঞানের একখানা ভালো পাঠ্যপুস্তক।ইউরোপীয় তথা ইংরেজদের আমরা যতই গাল দিই, বাংলার বিজ্ঞানে পশ্চিমী বাতাস না লাগলে হ্যাপা ছিল।বেশ কিছু বিদেশী ভারতকে বিশেষ করে বাংলাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন।তাঁরা বুঝেছিলেন, বিজ্ঞানে এগোতে না পারলে কোনো দেশেরই উন্নতি সম্ভব নয়।এ প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।মার্শম্যান, গুডইভ, উইলিয়াম ও ফেলিক্স কেরি, হাজার ল্যাঁফো, আলেকজান্ডার ডাব, পেডলার, ডেভিড হেয়ার, মহামতি বেথুন, ডিরোজিও এমনি সব মানুষরা বারে বারে লড়াইয়ে নেমেছেন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। ছাপাখানা থেকে কাগজ তৈরী, পাঠ্যপুস্তক রচনা থেকে বাংলার নবজাগরণে উনিশ শতক একটা আশ্চর্য সময়।কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্যে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, অক্ষয়কুমার দত্ত, জগদানন্দ রায়, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ আরও বহু মানুষ।এঁদের সবাই একটা কথা বুঝেছিলেন -- দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞান গবেষণায় উন্নতি করতে হবে।বিজ্ঞানকে জন-মানসে ছড়িয়ে দিতে হবে আর এটা করতে প্রয়োজন কার্যকরী ভাষা, বিজ্ঞানের কথা নিয়মিত প্রকাশের জন্য পত্রিকা।কমিটি তৈরী করে তৈরী হয়েছিল পরিভাষা রবীন্দ্রনাথের দায়িত্বে।

পরীক্ষা--পর্যবেক্ষণ--সিদ্ধান্তগ্রহন এর সাথে মেলাতে হবে চিন্তন তবেই তা হয়ে উঠবে বিজ্ঞান।বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাফল্য শুধুমাত্র পরীক্ষাগারের চার-দেয়ালে আটকে না রেখে তা ছড়িয়ে দিতে হবে সবার মাঝে।তবে দেশের স্বার্থে, বিজ্ঞানের স্বার্থে কিছু গোপনীয়তা রাখাও জরুরি।বিজ্ঞানকে আম-জনতার দরবারে পৌঁছে দিতে যে তিনটি ধাপের হাত আমাদের ধরতেই হবে তারা হলো -- বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, বিজ্ঞানচেতনার বিকাশ, ও বিজ্ঞানচেতনার প্রসার এবং মানবকল্যাণে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহার। বিজ্ঞানকে খুল্লাম-খুল্লা এবং বিস্তৃত পরিসরে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে সরকারি-বেসরকারী বৈজ্ঞানিক সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মুদ্রন ও ইলেকট্রনিক মাধ্যম আর এন জি ও রা। দু-একটি ব্যাতিক্রম ছাড়া ইদানিং কারও উৎসাহই আর এ ব্যাপারে তেমন চোখে পড়ে না। অথচ পঁচিশ_ত্রিশ বছর আগেও ছিল।সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে মানুষ না চাইছে শুনতে, না পড়তে।বহু ভুল আবর্জনার মতো জমা হচ্ছে আমাদের খবর ধরে রাখার খুপরিতে। কপাল দেখে ভাগ্য বলা থেকে পাথরের গনেশের দুধ খাওয়া অনেক কিছুই চলে এইসব সোশ্যাল মিডিয়াতে।তবে সবটাই ফেলনা একথা বলতে পারি না।বেছে নিতে হবে।বিজ্ঞানের কথা, ভাঙ্গা কুঁড়ে থেকে রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দেবার বেলায় এইসব প্রচার বহু ক্ষেত্রেই তার গতিপথে রুদ্ধ করে বৈ কি।লেখা হোক, বক্তৃতা হোক বা চলমান ছবি হোক, সঠিক বিষয় নির্বাচন করে একটি জমাটি গল্প বলতে হবে।মানে ভজাতে হবে।মন মজাতেই হবে।